অধ্যাপক ডঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর বক্তব্য

==========

প্রাক কথন

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষকদের শিক্ষা-প্রশিক্ষণ এবং গবেষণায় অধিকতর দক্ষ এবং যোগ্য হওয়ার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করার উদ্দেশ্যে ২০১৫ সালে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের নয় জন ভাইস চ্যান্সেলর কর্তৃক এফ এল টি আর (The Foundation for Learning, Teaching and Research) প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত ফাউন্ডেশন কর্তৃক Teaching for Active Learning এর উপর তিন দিনব্যাপি সার্টিফিকেট কোর্সের আয়োজন করা হয় যা ৫ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়ে জানুয়ারি ৭, ২০১৭ এ শেষ হয়। এই উপলক্ষে সার্টিফিকেট বিতরনী অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয় শেষ দিনে সন্ধ্যা ছয়টায় গ্রিন ইউনিভার্সিটির অডিটরিয়ামে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর এমিরেটাস ডঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন প্রফেসর জামিলুর রেজা চৌধুরী। নিম্নে প্রধান অতিথির প্রদত্ত গুরুত্বপূর্ন বক্তব্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

অধ্যাপক ডঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর বক্তব্য

প্রফেসর জামিলুর রেজা চৌধুরী, প্রফেসর গোলাম সামদানি ফকির, ভাইস চ্যান্সেলরবৃন্দ এবং সহকর্মীবৃন্দ।

আমি কোন আনুষ্ঠানিক বক্তৃতা দেব না। আমি কয়েকটা বিষয়ের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার এই সুযোগ গ্রহণ করব। আমি প্রথমেই অভিনন্দন জানাবো এই ফাউন্ডেশনকে যে, তারা অত্যন্ত জরুরী এবং প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিয়েছেন। যে নয় জন ভাইস চ্যান্সেলর এই উদ্যোগটা নিয়েছেন, তারা আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন থাকবেন যে, এই যে, লার্নিং টিচিং এবং রিসার্চ, এইটা যে শিক্ষার একটা অঙ্গাঅঙ্গি অংশ, শিক্ষক যে জন্মগতভাবে শিক্ষক হন না, তাকে শিক্ষার এই ট্রেনিং নিতে হয়, লার্নিং এর জন্য এবং রিসার্সের জন্য, সেই যে উপলব্ধিটা, এই উপলব্ধিটা যে তাদের মধ্যে এসছে, এবং তারা যে এই প্রতিষ্ঠানটা, এই ফাউন্ডেশনটা প্রতিষ্টা করেছেন, সে জন্য তারা আমাদের সকলেরই কৃতজ্ঞভাজন হয়ে থাকবেন। এই কাজটা অন্যরা হয়তো করতে পারত, ইউজিসি হয়তো করতে পারত, কিন্তু সেটা করেনি। আমি তাদেরকে অভিনন্দন জানাবো এবং আমরা, আমি খুবই অনুপ্রাণিত হচ্ছি, যে বিয়াল্লিশ জন এখানে এসছেন এ কোর্স নিতে এবং আরো অনেকে হতাশ হয়েছেন না পেরে, তো বোঝা যাচ্ছে, এটা অত্যন্ত কার্যকর এবং অত্যন্ত উপকারী একটা বিষয়। আর যে কোর্সটা এখানে নেওয়া হয়েছে, টিচিং ফর একটিভ লার্নিং, তো এই লার্নিং আপনারা নিজেরাই জানেন, আমার চাইতে এই বিষয়ে বেশি জানেন যে, একটিভ লার্নিং কতটা জরুরী।

এখন আমরা, এই যে শিক্ষকের কথা আমরা বলি, এইটাই প্রধান কথা এখানে যে, আমাদের দেশে আমরা সবাই জোর দিয়ে বলি, সবাই বলেন যে , শিক্ষা হচ্ছে জাতির উন্নতির প্রধান ভিত্তি। কিন্তু সেইটা নির্ভর করে অনেকগুলি উপাদানের উপর, অনেকগুলো ফ্যাক্টরস এর উপর। এবং তার মধ্যে শিক্ষক হচ্ছেন প্রধান। শিক্ষা আমরা কখনই দিতে পারবো না, যদি না শিক্ষক উপযুক্ত হন এবং শিক্ষকের উপযুক্ত হওয়ার উপর নির্ভর করে অনেকগুলো উপাদানের উপর, অনেকগুলো ফ্যাক্টরস এর উপর। সেখানে একটা হচ্ছে যে, শিক্ষকরা উপযুক্ত হবেন, ট্রেনিং নেবেন, দক্ষ হবেন, তারা রিসার্চ করবেন। বিশেষ করে ওপরের জায়গাতে গিয়ে। কিন্তু এইটা একমাত্র ব্যাপার নয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে কারা শিক্ষক হবেন, কোন কোন মানুষগুলি শিক্ষার ক্ষেত্রে আসবেন, সেইটে খুবই জরুরী বিষয়। এবং এই যে শিক্ষক হবার জন্য যে আগ্রহ, যে মেধা, মেধাবানরা শিক্ষার ক্ষেত্রে আসবেন, এইটে খুবই প্রয়োজনীয়। এবং সেটা নির্ভর করে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির উপর। এখন শিক্ষাকে আমরা কতটা গুরুত্ব দিচ্ছি রাষ্ট্রীয়ভাবে, সেটা খুব বিবেচনাযোগ্য। এবং আমাদের মত অনুন্নত দেশে, জনাকীর্ণ দেশে, অনুন্নত এবং জনাকীর্ণ সেই দেশে, শিক্ষা, সংস্কৃতি আমরা উন্নতি করতে পারব, মানুষকে সমৃদ্ধ করতে পারব এবং আমাদের সম্পদ যা আছে, সেইগুলোকে বিকশিত করতে পারব। কিন্তু এইটা দেখা যাচ্ছে যে, শিক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। রাষ্ট্রীয়ভাবেই দেওয়া হচ্ছে না। আমরা দেখছি যে, বাজেটে, জাতীয় বাজেটে যে পরিমাণ বরাদ্দ করার কথা ছিল, সেটা কমছে। আমাদের অনেকে বলেন যে, বাজেটের আমাদের মত দেশে শতকরা ২৫ ভাগ শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয় করা উচিত। সেটা করা হয় না, ১১, ১২ এগুলো কমতে থাকে, উচু নিচু হতে থাকে, জিডিপির, ইউনেস্কো এক সময় বলেছিল যে, শতকরা জিডিপির ৬ ভাগ শিক্ষার ক্ষেত্রে বরাদ্দ করতে হবে, কমিয়ে এনেছে, ৪ ভাগ বোধ হয় করেছে। আমরা একভাগও করতে পারিনি বরাদ্দ, বরাদ্দ করতে পারিনি। এটা গেল বরাদ্দ করার কথা। কিন্তু শিক্ষকদের জন্য, শিক্ষককে কেবলতো বরাদ্দের ব্যাপার নয়, শিকক্ষদের বেতন, শিক্ষকদের ভাতা, এগুলো দেখতে হবে। কেবল সেইটে যথেষ্ট নয়। সবচাইতে বড় যে বিষয়টা যে, শিক্ষককে মর্যাদা দিতে হবে এবং সেই মর্যাদাটা সামাজিকভাবে দিতে হবে। শিক্ষকের সেই মর্যাদা আমাদের সমাজে দেয়া হচ্ছে না ।

আমি কতগুলো স্থুল দৃষ্টান্ত দেব, যেগুলো মর্মান্তিক এবং সেইগুলো দিয়ে শিক্ষককে যদি মর্যাদা না দেই, তাকে যদি শ্রদ্ধা না করি, তাকে যদি বীরের সম্মান না দেই, তাকে যদি একজন মান্যগণ্য এবং আকষর্ণীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত না করি, তাহলে শিক্ষা কখনই যথার্থ হবে না এবং মেধাবান মানুষরা শিক্ষাক্ষেত্রে আসবে না। আপনারা জানেন যে, এই ঘটনাগুলি আমাদের জানা আছে। আমি অনানুষ্ঠানিক বলছি এটা, এই কথাগুলি বলছি যে, যেমন ধরেন, এই যে নারায়ণগঞ্জে একজন শিক্ষককে কান ধরে উঠানো বসানো করানো হলো। এবং এইটা তো সমস্ত শিক্ষকজাত, যারা শিক্ষাক্ষেত্রে আছেন, সকলের উপর অপমান, শিক্ষার অপমান। এবং সেই শিক্ষক বলেছেন যে, তার তিনটি অবিবাহিত মেয়ে আছে। তিনি যে বেঁচে আছেন, এটাই যথেষ্ট । এটা একটা দৃষ্টান্ত। আমি সম্প্রতি একটি বই পড়ছিলাম, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একজন ব্যক্তি তার স্মৃতিকথা লিখছেন, এবং স্মৃতিকথায় তিনি একথা বলছেন যে, কেউ কেউ, কোন কোন শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে, মনে রাখবেন, কোন কোন শিক্ষক বিশেষ করে দুইজন শিক্ষক তাকে পছন্দ করতেন না। একজন ছিলেন একেবারেই অপদার্থ। দুটো এডজেকটিভ ব্যবহার করছেন, একেবারে এবং অপদার্থ। একজন ক্ষমতাবান মানুষ, লেখার ক্ষমতা আছে। তার বই প্রকাশিত হচ্ছে এবং সেই সুযোগে তিনি যদি তার শিক্ষককে একেবারে অপদার্থ বলেন, তাহলে বোঝা যাবে যে, শিক্ষকের অবস্থানটা কোথায়। তিনি যখন ছাত্র ছিলেন, সেই সময় আমিও ছাত্র ছিলাম। সেই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন শিক্ষককে আমাদের অপদার্থ মনে হয়নি। একেবারে অপদার্থ মনে হওয়াটা অসম্ভব। আজকে আমরা শুনি যে, শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে দর্নীতি আছে, পক্ষপাতিত্ব আছে, টিআইবি বলছে, ঘুষ দেওয়া হয়, এইগুলো হয়তো সত্য। কিন্তু এখনো বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্যায়ে, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় বলি, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় বলি, কোন

শিক্ষককে আমি অপদার্থ বলতে পারব না। কোন শিক্ষককে আমি একেবারে অপদার্থ বলতে পারব না। যখন এই কথাটা বলা হচ্ছে, একেবারেই অপদার্থ আমার শিক্ষক ছিলেন, তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে, সমাজে যারা কর্তৃত্ব করে, সমাজে যারা, যাদের প্রভাব আছে, সমাজে যারা বিশিষ্ট ব্যক্তি, তারা তাদের শিক্ষকদেরকে কোন দৃষ্টিতে দেখেন। এবং এই যে এমন মর্মান্তিক আমার কাছে লেগেছে যে, সে কথাটা আপনাদেরকে আমি এখানে বলতে বাধ্য হলাম। আমি, আবার খবরের কাগজে আপনারা পড়েছেন বছর দুই আগে যে, একই ব্যাচের সিভিল সার্ভিস থেকে এসেছেন, শিক্ষা ক্যাডারে একজন গেছেন, আর অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে একজন গেছেন। এবং শিক্ষা ক্যাডারের সেই ভদ্র লোক পরীক্ষার হলে ডিউটি দিচ্ছিলেন, ঐ ইউএনও এসে, তিনি ওখানে কর্তৃত্ব দেখাতে চেয়েছেন, উনি বার করে দিয়েছেন। তারপরে ঐ শিক্ষককে, বিসিএস ক্যাডারের শিক্ষককে একই ক্যাডারের একই বছরের ঐ ইউএনওর কাছে প্রকাশ্যে মাফ চাইতে হয়েছে। তো এই রকম যখন শিক্ষাকে বরাদ্দ যথেষ্ট দিব না, শিক্ষককে মর্যাদা যখন দিব না, তখন আমাদের দেশের শিক্ষার ভবিষ্যতটা কি, এইটা আমাদের খুব চিন্তা করতে হবে। এবং আমরা মেধাবান মানুষকে আকর্ষণ করতে পারব না। এখন বলা হচ্ছে যে, আবার আবার শুনছি যে, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হতে হলে পরীক্ষা দিতে হবে। পরীক্ষা দিয়েই তো এসেছে। এবং পরীক্ষা দেওয়ার পরে তার মেধা পরীক্ষিত হয়েছে। আপনি ইন্টারভিউ নিয়ে বুঝতে পারবেন যে, তার যোগ্যতা আছে কিনা। তার শিক্ষাক্ষেত্রে আকর্ষণ, তার ক্ষেত্রে মনোযোগ আছে কিনা। তিনি সম্ভাবনা ধারণ করেন কিনা। প্রপারলি আবার পরীক্ষা দিতে হবে, এই যে সমস্ত কান্ডগুলি হচ্ছে, এই সমস্ত বিষয়গুলিকে আমাদের শিক্ষক হিসেবে আমাদেরকে সচেতন হতে হবে। এবং এও আমাদেরকে জানতে হবে যে, এ রকম ঘটনা ঘটছে।

এখন বাংলাদেশে আমরা যখন শিক্ষার সাথে জড়িত, বাংলাদেশের সব চাইতে বড় সমস্যা হচ্ছে, আমরা তিন ধারায় শিক্ষা দিচ্ছি। এর চাইতে এই রকম ব্যাপারটা অকল্পনীয় যে, আমরা, পাকিস্তান আমলে তিন ধারার ছিলো। বাংলাদেশ আমলে এক ধারা থাকবে, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা হবে, এইটা ছিলো আমাদের স্বপ্ন, এইটা ছিলো আমাদের অঙ্গীকার, এইটা ছিলো আমাদের চ্যালেঞ্জ। সেই স্বপ্ন, সেই অঙ্গীকার, সেই চ্যালেঞ্জ আমরা মোকাবেলা করতে পারিনি এবং কত বড় ক্ষতি হচ্ছে এই তিন ধারার মধ্যে, আমরা কল্পনা করতে পারব না। এবং এখন যখন আমরা বুঝব, তখন অনেক দেরী হয়ে যাবে। কিন্তু এইটা সম্ভব না, যদি সমাজে আপনি একটা বৈপল্লিক পরিবর্তন না ঘটান। কালক্ষেপণ, কেননা তিন ধারা নির্ভর করছে শ্রেণী বিভাজনের ওপরে। এবং এই শ্রেনী বিভাজনকে শিক্ষার মধ্য দিয়ে আমরা গভীর করছি। শিক্ষার মধ্য দিয়ে আমরা তাকে প্রসারিত করছি। এত বড় অন্যায় তো আর হতে পারে না। যে শিক্ষার মধ্য দিয়ে আমরা সমস্ত জনগোষ্ঠীকে এক সাথে আনবো, সমস্ত মানুষকে একত্র করবো, তা না করে, আমি তাদের মধ্যে বিভাজন তৈরী করছি। এবং আমি দেখতে, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, শ্রেণীবিভাজন কত মারাত্মক হবে এবং এর মধ্যে যে সমীকরণ, সেই সমীকরণ কিছুতেই সম্ভব হবে না। ভীষণ গোলযোগ দেখা দিবে। এবং আমরা উন্নতি করতে পারবো না। তা এই তিন ধারার শিক্ষার ফল আমরা জানি। আমরা শিক্ষক, আপনারা সবাই জানেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, কি ধারা দাঁড়াচ্ছে ব্যাপারটা এবং কোথায় যেয়ে এর পরিণতি হতে পারে।

এখন অতি সম্প্রতি এই যে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিলি করা হলো, এর মধ্যে তো দেখলেন, আপনারা লক্ষ্য করেছেন, এটি কিন্তু ইংরেজি মাধ্যমে যারা পড়ছে, তাদের মধ্যে কোন বিপদ নেই। ইংরেজি মাধ্যমের বইগুলো ঠিক আছে। সেইগুলিতে কোন ভুল নেই। সেগুলিতে কোন রদবদল নেই। কিন্তু বাংলা মাধ্যমে যারা পড়ছে, সেই বাংলা মাধ্যমে আমরা দেখছি যে, সেখানে ভুলে ভরা, নানান রকম ভুল এবং বই বদল করা হয়েছে। বইয়ের পিস বদল করা হয়েছে। তো এই যে খেলাধুলা করা হচ্ছে, এই যে বারবার পাবলিক বৈঠক হচ্ছে, অপ্রয়োজনীয় কিশোরদেরকে পাবলিক পরীক্ষায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, এইগুলো ভয়ংকর জিনিস হচ্ছে। এবং এই যে, মূল যে ধারা, মূল ধারা বিপন্ন হচ্ছে এইটার মধ্য দিয়ে।

আমরা দেখছি, বাণিজ্য কিভাবে শিক্ষাক্ষেত্রকে আক্রমণ করছে। এবং শিক্ষা পণ্যে পরিণত হচ্ছে। শিক্ষাকে, আমরা বলি, মানবিক বিকাশ করবে, মেধার বিকাশ করবে, সম্ভাবনাগুলিকে বিকশিত করে তুলবে, সেইটা না করে শিক্ষা এখন ক্রয় বিক্রয়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবং যেমন করে চিকিৎসা আপনাকে কিনতে হয়, তেমন করে শিক্ষাও আপনাকে কিনতে হচ্ছে এবং তারই নিদর্শন হচ্ছে যে, যারা, সরকারীভাবে বলা হয়েছিলো যে, কোচিং সেন্টার একেবারে নিষিদ্ধ হবে, আইন করে নিষিদ্ধ করা হচ্ছে। তাদের ধরে আনা হবে, শাস্তি দেওয়া হবে। সেইখানে কোচিং সেন্টারকে এখন বলা হচ্ছে, এইটা হচ্ছে ছায়া। এইটে হচ্ছে শিক্ষার ছায়া প্রতিষ্ঠান। এখন একজন চিকিৎসককে (শিক্ষার্থীকে) আপনি পাঠাচ্ছেন স্কুলে, সে স্কুলে থাকছে, স্কুল শেষ করার পরে সে ছায়ার কাছে যাবে। এবং ছায়া, সে কখন খেলাধুলা করবে, কখন সাংস্কৃতিকভাবে বিকশিত হবে, সেইগুলি কিছুই নেই। করতেছে, ক্লাসরুমে পড়বে, কোচিং সেন্টারে যাবে, কোচিং সেন্টারে না গেলে তার পড়াশোনা হবে না। কেননা শিক্ষক এই রকম ধারণা দিবেন যে, তিনি কোচিং সেন্টারকে বেশি গুরুত্ব দেন। এবং আমাকে বলেছে, হেড মাষ্টারদের কাছে এরকম শুনি যে, টিচারেরা বাধ্য হন। বাধ্য হন, আমি কথাটা বলব, নানান চাপে। স্কুলে আসার আগে কিছুটা পড়ান বাড়িতে, স্কুলে এসে বিশ্রাম নেন, তারপর এখান থেকে বেরিয়ে আবার কোচিং সেন্টারে চলে যান। তো এই শিক্ষক কেমন করে পড়াবেন। কি করে ট্রেনিং নিবেন। এবং এই ট্রেনিং এর কথা প্রসঙ্গে যখন আসছে, আমি এই সুযোগে বলে নেই, ট্রেনিং ছাড়া তো আপনি কখনও বিকশিত হতে পারেন না। আবার আমি ফাউন্ডেশনকে, আবারো ঐ জন্য অভিনন্দন জানাবো যে, তারা এই কাজটা করছেন। যে আমাদের সময়, আমাদের কৈশোরে আমরা দেখতাম যে, গুরু ট্রেনিং ছিলো। তারপরে সেটা হয়েছিল পিটি, প্রাইমারী ট্রেনিং, টিচারদেরকে শিখতে, প্রশিক্ষণ দিতে হয়েছে। তারপরে বি.এড. ছিল। যারা শিক্ষক হবেন, তাদেরকে আগে বি.এড. করতে হতো। না হলে পরে পি.এড. করতে হত। পি.এড. না করে শিক্ষক হতে পারতেন না। এবং উপরের দিকে গেলে সামার কোর্স ছিলো, সেই সামার কোর্স-টোর্স নেই। এখন কোন ট্রেইনিংয়ের বন্দোবস্ত নেই। এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে রিসার্চ নেই। আমরা তো জ্ঞান বিতরণ করবো ঠিক আছে, কিন্তু জ্ঞান তো সৃষ্টি করতে হবে। জ্ঞান যদি সৃষ্টি না করি, তাহলে আমরা কি বিতরণ করবো? এবং রিসার্চ তো পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে নেই, প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে কিনা ব্যবস্থাই করতে পারছে না এবং রিসার্চের উপরে এখন নির্ভর করে না আপনার উন্নতি। শিক্ষার ক্ষেত্রে আপনি প্রমোশন পেয়েই যাবেন। পাবলিকেশনের দরকার নেই, রিসার্চ দরকার নেই। তো এইটাতে আমরা, ঐ যে আমাদের মর্যাদা, সেই মর্যাদা এইভাবেও বাড়াতে পারছি না। ফ্যাকাল্টিতে, আবার আমি অভিনন্দন জানাবো ফাউন্ডেশনকে যে, তারা এই কাজটা করছেন।

আমি ফেরত যাই ঐ বিষয়টাতে, যখন পৃথিবীতে বাংলাভাষী মানুষের সংখ্যা, যদি আপনি সংখ্যাতাত্ত্বিক বলেন, তাহলে ৫ম স্থানে দাঁড়াবে। কিন্তু আমরা মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার বন্দোবস্ত করতে পারলাম না সর্বস্তরে। আমরা ভাগ করে ফেললাল। এবং এই যে ঘনীভূত করতে পারলাম না, এইটা কিন্তু চ্যালেঞ্জ ছিলো যে, যে, আমরা একটি জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করলাম বা ভাষাতাত্ত্বিক জাতীয়তাবাদী। কিন্তু ঐ চ্যালেঞ্জটা নিতে পারলাম যে, আমরা বই লিখব, আমরা অনুবাদ করব, আমাদেরকে, আমাদের ভাষাকে এমন জায়গায় নিয়ে যাবো যে, তার ধারণ ক্ষমতা অসাম্প্রদায়িকভাবে বিকশিত হবে। এবং কোন শিক্ষা কখনো কেউ বলবে না যে, কোন শিক্ষা যথার্থ হয়, স্থায়ী হয় এবং উপযুক্ত হয়, যদি না তা মাতৃভাষায় মাধ্যমে হয়। তো আমরা যে শিক্ষা দিচ্ছি, যে শিক্ষার মধ্যে যে কৃত্রিমতা আছে, যে বাণিজ্যিকতা আছে, সেইটা এইখানে আসে, যে আমরা মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দিতে পারছি না।

আমি, আমি জ্ঞানের কথা যখন ওঠে, শিক্ষার কথা যখন ওঠে, তখন আমরা এটা জানি যে, Knowledge is power, জ্ঞানই হচ্ছে শক্তি। কিন্তু কোন ধরনের জ্ঞান আমরা বিতরণ করবো, সেই প্রশ্নটা খুব জরুরী এবং আমি আমি ফ্রান্সিস বেকনের প্রবন্ধ

একটা আছে 'অফ স্টাডিস', যেটা আমরা আমি ছাত্র অবস্থায় পড়েছি, পড়িয়েছি, এবং যেটা আমার সব সময় মনে থাকে যে, বেকন ঐ কথাটার, Knowledge is power, এ কথাটা বেকন বলেছিলেন, ফ্রান্সিস বেকন, রেনেসাঁর সময়। কিন্তু প্রশ্ন তুলেছিলেন যে, কোন ধরনের জ্ঞান? তিনি তিন ধরনের জ্ঞানের কথা বলেছেন, একটা হচ্ছে, মাকড়সার জ্ঞান। মাকড়সা কি করে? খুব দক্ষ, খুব সুক্ষ্ম, খুব চাতুর্যপূর্ণ জাল তৈরী করতে পারে, যে জালটার মধ্যে সে আবদ্ধ থাকে, যে জালটার মধ্যেই সে মারা পড়ে। এবং যে জালটা সমাজের কোন উপকারে লাগে না। কিন্তু মানুষ এটা বিরক্ত হয় এই জাল, এই জঞ্জাল দেখলে। সেটা এক ধরনের জ্ঞান, সুক্ষ্ম, খুবই সুক্ষ্ম, দক্ষ। আরেক ধরনের জ্ঞান, সেটা পিঁপড়ে, পিপীলিকার, পিপীলিকা, পিপীলিকা সারাক্ষণ চলছে, ছয় পায়ে হাঁটছে, সংগ্রহ করছে, কেবল সংগ্রহ করছে, কিন্তু সে জ্ঞানকে ব্যবহার করতে পারছে না। বিন্যস্ত করতে পারছে না। খুব চাপা চাপের মধ্যে আছে, এটাও একটা জ্ঞান, সংগ্রহ কর, সংগ্রহ কর। আরেকটা জ্ঞান হচ্ছে, মৌমাছির জ্ঞান। সে মৌমাছি কি করে ? মৌমাছি সে চেনে, মৌমাছি, কোথায় ফুল, ফুলের মধ্যে মধু আছে, সেই মধু সংগ্রহ কিন্তু করে, এবং মৌমাছি সেটা করতে পারে, সে এটাকে বিন্যাস করতে পারে, সে তার চাপ তৈরী করতে পারে। সে একটা সমাজ তৈরী করে। এবং এই যে এই চাপ তৈরী করলো, সমাজ তৈরী করলো, বিন্যস্ত করলো তার জ্ঞানকে, এইটে অনেক উন্নত জ্ঞান। ঐ মাকড়সার জ্ঞানের চাইতে, ঐ পিপীলিকার জ্ঞানের চাইতে কিন্তু মানুষের যে জ্ঞান, সে জ্ঞান ঐ মাকড়সারও নয়, সে জ্ঞান পিপীলিকারও নয়, সে জ্ঞান মৌমাছিরও নয়। সেই জ্ঞান হচ্ছে, মানুষের জ্ঞান, যে মানুষ, নতুন নতুন সৃষ্টি করে, বৃত্তের মধ্যে থাকে না, মৌমাছি ঘোরে ঐ বৃত্তের মধ্যে, সে কখনো ঐ বৃত্তকে ভাঙতে পারবে না। জ্ঞানের কাজ হচ্ছে, এই বৃত্ত ভেঙ্গে ক্রমাগত অগ্রসর হওয়া। এবং আমরা যে জ্ঞানের চর্চা করছি, জ্ঞানের জন্য যে সাধনা করব, সেই কাজটা হচ্ছে, এই বৃত্তকে ভাঙ্গা, এবং এইখানে নতুন নতুন জায়গায় নিয়ে যাওয়া, দু:সাহসী অভিযান করা, সেই দু:সাহসী অভিযানটাই হচ্ছে জ্ঞানের কাজ। এবং জ্ঞান এইখানেই শক্তিশালী যে, সে মানুষকে এই শক্তি দেয়, যাতে করে সে বৃত্ত ভাঙ্গতে পারে। এবং যাতে করে নতুন নতুন জায়গায় সে গিয়ে পৌঁছাতে পারে। তো আমি এই এই বিষয়গুলির প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। এই।

এবং আমার কাছে খুব ভালো লাগলো এটা দেখে যে, এই ফাউন্ডেশন, এই ফাউন্ডেশন তাদের মটো হিসেবে যেটা বলেছেন শুরুতে, When educating the minds of a youth, we must not forget to educate their hearts, এই যে মাইন্ডস এবং হার্টস দুটোকেই এডুকেট করতে হবে, এইটা কিন্তু খুব জরুরী কথা। আমরা যদি কেবল ইনটেলেক্টকে বিকশিত করি, তাহলে সেই ইনটেলেক্ট স্বার্থপর হবে। এবং আমাদের সমাজে আমাদের এই বিদ্যমান সমাজে যেটা ঘটছে, সেটা হচ্ছে যে, এলিয়েনেশন হচ্ছে, বিচ্ছিন্নতা হচ্ছে, যে, ইনটেলেক্ট খুব ডেভেলপ করছে, স্কিল, সাইন্স খুব ডেভেলপ করছে এবং সেই ডেভেলপমেন্ট এর পরিচয় হচ্ছে, আজকের সারা পৃথিবীতে যে যে যে নৈরাজ্য, যে হতাশা বিরাজ করছে, সেটা আমরা দেখছি। যে এই যে আমেরিকান ইলেকশন এ ডোনাল্ড ট্রাম্প এর মত একজন লোক, কত নিম্নস্তরের লোক, ব্যবসায়ী, একেবারে কোনদিন রাজনীতি করেনি, সেই লোক এখন সব চাইতে বড় রাষ্ট্রের, সব চাইতে শক্তিশালী রাষ্ট্রের বড় না হোক শক্তিশালী, সেই রাষ্ট্রের সব চাইতে শক্তিশালী মানুষে পরিণত হয়ে গেল, ব্যবসায়ী, ব্যবসার জোরে। এবং বিদ্বেষ, সে সূক্ষ্মভাবে, এই বুদ্ধি খাটিয়ে ব্যবহার করল কি? ব্যবহার করল বর্ণবাদকে, ব্যবহার করল অভিভাসীদের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী, উগ্র জাতীয়তাবাদী ফ্যাসিজমকে, ব্যবহার করল নারীবিদ্বেষকে। সেই যে বুদ্ধি, এই বুদ্ধি খাটিয়ে সে চলছে। এবং গোটা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা আজকে, বিশেষ করে আমেরিকা, নির্ভর করছে কিসের উপর ? নির্ভর করছে যুদ্ধ অস্ত্র বিক্রির উপর। এবং যুদ্ধ তাকে লাগাতেই হবে। যুদ্ধ লাগাচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্যে আগুন জ্বলছে, সারাদেশকে উত্তপ্ত করছে, সারা বিশ্বকে উত্তপ্ত করছে। অস্ত্র বিক্রি করতে হবে। তাহলে বিজ্ঞান এখানে অস্ত্র তৈরীতে পরিণত হচ্ছে। আইটি করছে এবং আইটির ভালদিক আছে, মন্দ দিক আছে, সেটা গেল। ড্রাগ

ব্যবসা করছে। এই সমস্ত ব্যবস্থা করে, বুদ্ধি খাটিয়ে পৃথিবীতে নিজের মধ্যে এনে রেখেছেন এবং নিম্নস্তরে সবচেয়ে আমেরিকান সভ্যতাকে আমেরিকান সমাজে, বহুলোক, অসংখ্য মানুষ ডোনাল্ড ট্রাম্প এর চাইতে উন্নত মানের। কিন্তু তারা প্রেসিডেন্ট হবে না, প্রেসিডেন্ট হবে ঐ মানের একজন মানুষ এবং আজকে সারা পৃথিবীতে এই ভাঙ্গন ধরেছে। আজকে এই ইউকে ইউকে এই ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে গেল, বেরিয়ে যেয়ে সংকীর্ণ হল। এবং এখন ইউকের যে স্কটল্যান্ড, আলাদা হতে চাচ্ছে, আয়ারল্যান্ড আলাদা হতে চাচ্ছে, লন্ডন বলছে, আমরা স্বাধীন হব। আমেরিকাতে ক্যালিফোর্নিয়া বলছে, আমরা তোমার সাথে এক সাথে থাকবো না। এই ভাঙ্গনগুলো এই গৃহ বিবাবদগুলো চলে আসছে। এবং এখন এই পুজিঁবাদের যে দু:শাসন, সেই দু:শাসন, এই বুদ্ধি, এই শয়তানি বুদ্ধি তৈরী করছে। সেখানে মানুষে মানুষে ঝগড়া, গৃহ বিবাদ এখন বাইরে যুদ্ধ তো হচ্ছেই, গৃহের মধ্যে যুদ্ধ হচ্ছে, গৃহের মধ্যে সহিংসতা হচ্ছে। এই সমস্তটা হচ্ছে, এই স্বার্থপর এই আত্মকেন্দ্রিক, এই পুঁজিবাদী বুদ্ধির কাজ। সেইখানে এই যে হৃদয়কে চর্চা করতে হবে, হৃদয়কে শিক্ষিত করতে হবে, এইটে খুব জরুরী।

আমরা বলি, আমাদের হৃদয় খুব প্রশস্ত, আমরা বলি আমাদের হৃদয় খুব উষ্ণ, আমাদের হৃদয়। কিন্তু আমাদের হৃদয় শিক্ষিত নয়। আমাদের আবেগ বেশি, আমাদের উচ্ছ্বাস বেশি, আমাদের রেটরিক বেশি, বাগাড়ম্বর বেশি এবং সেই যে আবেগ, সেই যে উচ্ছ্বাস, সেই যে বাগাড়ম্বর, সেইগুলো হচ্ছে অশিক্ষিত হৃদয়ের লক্ষণ। যে শিক্ষা, হৃদয়কে আপনি সংবেদশীল করবেন, কিন্তু শিক্ষিত করবেন। সে জন্য যেটা দরকার হবে, সেটা হচ্ছে, এই বুদ্ধি এবং হৃদয়। এই যে ইন্টেলেক্ট এবং এই যে হার্ট, এই দুইয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকবে, একে অপরকে প্রভাবিত করবে, বৈরী দ্বন্দ্ব নয়। একে অপরকে পরাভূত করবে বা হারিয়ে দিবে, তা নয়। এই দ্বন্দ্বের মধ্যে হৃদয় এবং বুদ্ধির দ্বন্দ্বের মধ্যে, আমাদের মানসিকতা বিকশিত হবে, দৃষ্টিভঙ্গি বিকশিত হবে। বুদ্ধি হৃদয়ের সংস্পর্শ হয়ে বিবেকবান হবে এবং হৃদয় বুদ্ধির সংস্পর্শ হয়ে বুদ্ধিমান হবে, প্রয়োগশীল হবে, সৃষ্টিশীল হবে। কাজেই এইটাকে আমি খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করি যে, হার্টের যে এডুকেশন, কেবল ইন্টেলেক্ট এর এডুকেশন নয়, মাইন্ডের এডুকেশন নয়, হার্টের যে এডুকেশন, সেইটে খুব জরুরী। এবং আমাদের এই যে এই কমোডিসিফিকেশন ঘটছে, এই যে পুঁজিবাদী আগ্রাসন ঘটছে, তার ফলে এখন আমরা এটা দু:খজনক সত্য যে, দু:খজনক সত্য যে, বিজ্ঞানের প্রতি মানুষের আকর্ষণ ঘটছে, বিজ্ঞান শিক্ষা ঘটছে না। এবং যে বিজ্ঞান, যে ব্যসিক বিজ্ঞান, সেগুলো পড়ছে না। আমরা দেখছি যে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দর্শন, ইতিহাস এগুলোর চর্চা অত্যন্ত নিচু পর্যায়ে চলে গেছে। এখন ইতিহাস পড়ে না, ইসলামের ইতিহাস পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে, কেননা ভালো নম্বর পাওয়া যায়। এখন ইতিহাস যদি না চর্চা করেন আপনি, সে আপনি ইতিহাস যদি না চর্চা করেন, তাহলে তো আপনি বর্তমানকে বুঝবেন না। আপনি অতীতকে তো জানবেন না। আপনি ভবিষ্যতের যে কল্পনা, সেটিতো সৃষ্টি করতে পারবেন না। এবং ইতিহাস কেবল স্মৃতিরভ্রম নয়। ইতিাস যদি না জানি, আমার স্মৃতি যে নাই, হারিয়ে গেছে, সেটা নয়। ইতিহাস যদি আমি না জানি, তাহলে আমি নিজেকেও চিনতে পারব না। আমি কোথায় আছি, সেটা জানতে পারব না। আমার কোথায় দুর্বলতা, সেটা জানতে পারবন না। ইতিহাস এখন, সরকার বদল হয়, তখন ইতিহাসও বদল হয়। এই যে ইতিহাসের চর্চা হচ্ছে না, এইটা তো ভয়ংকর সত্য। এই যে দর্শনের চর্চা হচ্ছে না, এটা তো ভয়ংকর সত্য।

এবং আমি আরেকটা দৃষ্টান্ত দিয়ে, আমি অনানুষ্ঠানিক কথা বলছি, সে জন্য আরেকটা ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত দেই। সম্প্রতি আমি একটা প্রবন্ধ পড়েছি, এক জায়গাতে বক্তৃতার আকারে, সেটার নাম ছিল 'দর্শনের সুখানুসন্ধান'। অর্থাৎ দর্শন সুখের সন্ধান করছে, মানুষকে কিভাবে সুখ দেওয়া যায়, হ্যাপীনেস, কিভাবে মানুষের সুখের ব্যবস্থা করা যায়। দর্শন কিভাবে যুগে যুগে সেই চিন্তাটা করেছে। ঠিক আছে, তো আমার দু'জন বিজ্ঞ বন্ধু, তারা এই দেখেছেন, শুনেছেন যে, আমি একটা বক্তৃতা দিয়েছি। তো বললেন যে, তারা যে, আমার এ বক্তৃতা তাদেরকে আকর্ষণ করেছে। আমি এখানে যে, যে 'দর্শনের সুখানুসন্ধান' না, নাম ছিল

‘সুখানুসন্ধান’ । দর্শনের অনুভূতি, এইটার উপরে আমি প্রবন্ধ লিখেছি, তাদের ধারণা হয়েছে। দর্শনের অনভূতি, সুখানুভূতি, সুখের অন্বেষণ নয়, সুখের অনুভূতি, এইটা কিন্তু খুব তাৎপর্যপূর্ণ আমার কাছে, মনে হল যে, সন্ধান এবং অনূভূতি। আমি সন্ধান করবো, বাইরে খুঁজবো, সারা পৃথিবীতে জ্ঞান খুঁজবো। আর আমার অনুভূতি আছে। এটা আমার অনুভূতি ভেতরে আছে। কিন্তু যখন আমি ঐ সন্ধানকে অনুভূতিতে পরিণত করি, যখন আমার ঐ কোয়েষ্ট থাকে না, যখন আমার ঐ সার্চ থাকে না, যখন আমার ঐ এনকোয়ারি থাকে না, যখন আমি কেবল ঐ যে হৃদয়কেই বলি যে, ঐ অনুভূতিটা এসেছে, অনুভূতির জগতে আমি আটকে যাই। তখন ভয়ংকর বিপদ হয়। আমরা এখন ঐ বড় জায়গা থেকে, বড় পৃথিবীতে বাস করি, খবর আছে, ইনফরমেশন আছে, সমস্ত ইনফরমেশন আমার হাতের নখের ডগায় আছে। কিন্তু আমার নলেজ নেই, আমার উইজডম নেই, এবং এই নলেজ, যখন ইনফরমেশনকে আমি নলেজ করতে পারছি না, নলেজকে আমি উইসডমে ট্রান্সফর্ম করতে পারছি না, তার মানে হচ্ছে যে, আমার ঐ কোয়েস্টটা নেই। আমার ঐ দর্শনের যে কথাটা আমি বলছিলাম অনুসন্ধান, সেই অনুসন্ধান নেই। এবং যেটা বড় হয়ে দাঁড়াচ্ছে, সেটা হচ্ছে আমি, আমার অনূভূতি, অনুভূতি আমার ছোট জগত এবং কেবলই ছোট হচ্ছে, বিশ্ব যত বড় হচ্ছে, বিশ্ব যত আমার নখদর্পণে আসছে, ততই ব্যক্তিগতভাবে আমি বিচ্ছিন্ন হচ্ছি। ব্যক্তিগতভাবে আমি সংকীর্ণ হচ্ছি এবং আমি আমার অনূভুতির জগতে চলে আসছি। আমার এই বক্তৃতাকে আমি শেষ করেছিলাম এই কথাটা বলে যে, যেটা প্রয়োজন, সেটা হচ্ছে, প্রয়োজনের জগত থেকে আমি স্বাধীনতার জগতে যাবো। আমার যে প্রয়োজনের যে জগত আছে, ছোট জগত আছে, সেই জগতটাকে অতিক্রম করে আমি আমার একটা স্বাধীনতার জায়গায় যেতে চাইবো এবং সেইটেই হচ্ছে মানুষের চিরকালের সাধনা। সেই জায়গায় না গিয়ে, আমি যদি ঐ স্বাধীনতার জগতে বড় জগতে, সন্ধানের জগতে না গিয়ে, আমি যদি অনুভূতির জগতে চলে আসি, আমি যদি আমার সংকীর্ন স্বার্থের জগতে চলে আসি, আমি যদি আমার কিছু সুবিধা হয়, বস্তুগত সুবিধা হয়, সেইটে সর্বক্ষণ অনুসন্ধান করতে পারি, থাকি, তাহলে যে বিপর্যয় ঘটবে, সেই বিপর্যয়ের লক্ষণ আজকের পৃথিবীতেও আমরা দেখছি। আজকের যুগ, আগের যুগ ছিলো বড় যুদ্ধের, দুইটি বড় বিশ্বযুদ্ধ দেখেছি। সেই যুদ্ধ আর হবে না। স্থানীয় যুদ্ধ হচ্ছে এবং যেটা এই যুগেও আমরা প্রবেশ করছি, ডোনাল্ড ট্রাম্পের যুগে, সেটা হচ্ছে গৃহযুদ্ধ । এবং এ গৃহের মধ্যে, আমাদের রাষ্ট্রের মধ্যে, সমাজের মধ্যে এবং গৃহে গৃহে যে একটা সংঘর্ষ বাঁধবে, সেইটার দিকে যাচ্ছে। সেই জন্যই এডুকেশনটাকে আমাদের ঐ হার্টের এডুকেশন, আমাদের ঐ ইনটেলেক্ট এর এডুকেশন দুটোই করতে হবে। আমাদের ঐ কোয়েষ্ট, আমাদের এই অনূভুতি, এইটা পরস্পর বিরোধী হবে না। আমরা কোয়েষ্টকে ভুলে অনূভূতির জগতে চলে যাবে না এবং কোয়েষ্ট এ যখন যাবো, তখন আমাদের অনুভূতি থাকবে, যে মানবিক অনূভুতি থাকবে, আমি স্বার্থপর হবো না, আমি স্বার্থ, কেবল নিজেরটা দেখব না।

আমি শেষ করি এই কথা বলে যে, আমরা যখন এই শিক্ষা দিচ্ছি, তখন কথা উঠে যে, শিক্ষার মান নামছে। মান যে নামছে সেটা সত্য, অনেক কারণে নামছে মান, মান। একটা কারণ হচ্ছে, বড় কারণ হচ্ছে, আমি মনে করি, প্রধান কারণ সেটা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে যে, শিক্ষার্থীর আগ্রহ নেই। যে ছাত্র আসছে পড়তে, তার আগ্রহ নেই। আগ্রহ নেই কেনো ? কারণ শিক্ষার সঙ্গে তার জীবিকার সম্পর্ক নেই। আমরা যখন পড়তাম, তখন আমরা জানতাম যে, কোন রকম একটা ডিগ্রী পেলে, একটা কিছু করতে পারব, একটা কাজ হবে। একটা জায়গায় যেতে পারব। একবারে বেকার থাকব না। কিন্তু এখন যে তরুন পড়ছে, সে জানে যে, এইখান থেকে বেরিয়ে আরেকটা জগতে যখন প্রবেশ করবে, সেটা অনিশ্চিত জগত, সেটা প্রতিযোগিতার জগত, সেটা একটা, সেটা একটা ভীষন হিংস্র জগত। সে জগতকে সে ভয় পায়। কাজেই শিক্ষার তার আগ্রহ বাড়ছে না। সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছে। সে ভাবছে যে, এখান থেকে বেরিয়ে গেলে তার কী হবে। ঐ আগ্রহ বেকারত্বের সঙ্গে জড়িত। আমরা বেকার সংখ্যা বাড়াচ্ছি।

শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বাড়াচ্ছি। এবং যে পুঁজিবাদী দেশের সমালোচনা করি, সেখানে তারা প্রত্যেক মাসে হিসাব করে যে, এই কর্ম সংস্থান বাড়ছে না কমছে। কর্মসংস্থান কমলে অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়, আমরা ঐ খবর নেই না যে, কর্মের কাজ বাড়ছে কিনা, কর্মসংস্থান বাড়ছে কিনা এবং সংস্থান না বাড়লে, শিক্ষা তো কার্যকর হবে না। শিক্ষাতে আগ্রহ হবে না। দ্বিতীয় কাজ, দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে যে, শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহণ করবার ক্ষমতা বাড়ছে না। সাংস্কৃতিকভাবে, সামাজিকভাবে আমাদের শিক্ষার্থীদেরকে আমরা বিকশিত করতে পারছি না। এইটা আমার কাছে অভাবনীয় মনে হয় যে, আমাদের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গত পঁচিশ বছর ধরে কোন ছাত্রসংসদ নেই। আমি, নিজের মনে আছে আমার, আমি রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলাম এবং তখনই ভর্তি হয়ে প্রথম বছরে আমি সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ইউনিয়নের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ঐখানে নির্বাচিত হয়েছিলাম সদস্য হিসেবে। এবং সেই যে শিক্ষা, সেই শিক্ষা আমি গ্রহণ করেছি সারাজীবন। সেখানে যে প্রতিযোগীতা হত, বিতর্ক হত, গানবাজনা হত, নাটক হতো, খেলাধূলা হত এক হলের সাথে আরেক হলের প্রতিদ্বন্দ্বীতা হচ্ছে, কে জিতছে, কে হারছে, এবং তারাই তারাই এই নির্বাচনগুলিতে জিতত, যে ছেলেরা মেধাবান, ছাত্র হিসেবে ভালো, সামাজিকভাবে ভালো মিশতে পারে মানুষের সঙ্গে এবং মেধায় ভালো। মেধাবান ছাড়া কোন ছাত্র কখনো আমাদের সময়ে নির্বাচিত হতে পারত না। আমরা ঐ জায়গাটাকে একেবারে নষ্ট কর দিয়েছি, বন্ধ করে দিয়েছি। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এটা সম্ভব না। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রসংসদ আছে, ছাত্রদের ইউনিয়ন ফি আছে। আমি নয় বছর বিশ্ববিদ্যালয়ে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্রেজারার ছিলাম এবং আমি দেখেছি যে, ডাকসুর কি ভূমিকা পালন করছে। যে নেতৃত্ব সর্বক্ষেত্রে তৈরী হয়েছে, ব্যবসা থেকে শুরু করে রাজনীতি এবং শিক্ষা সমস্ত ছিলো ঐখানে সে লালনভূমি । আমরা শিখতাম ক্লাসরুমে, আমরা শিখতাম লাইব্রেরীতে, আমরা শিখতাম ঐ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলিতে, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায়। আজকে ঐগুলি নেই। কাজেই কেবল দোষ দিলে লাভ হবে না। দেখতে হবে, কেবল রোগের কথা বললে হবে না, রোগের লক্ষণগুলি দেখতে হবে আমাদের, রোগটার কারণ কি, সেইটাকে চিহ্নিত করতে হবে এবং আমরা যারা শিক্ষাক্ষেত্রে আছি, তারা শিক্ষার কথা ভাববো। কিন্তু আমরা এটাও ভাববো যে, শিক্ষা কোন সমাজবিচ্ছিন্ন বিষয় নয়। এবং শিক্ষা গোটা সমাজেরই অংশ। এবং গোটা সমাজেই যে রোগ, সে রোগ শিক্ষাকে আক্রমণ করছে। প্রতিনিয়ত আক্রমণ করছে এবং এই সমাজের সাথে শিক্ষার যে দ্বন্দ্ব, সেই দ্বন্দ্বে আমরা কোন ভূমিকা নেবো, ব্যক্তিগতভাবে পারব না, সমষ্টিগতভাবে আমরা কোন ভূমিকা নেব, সেইটা আমাদেরকে ভাবতে হবে। আমি, যারা এই কোর্সে যোগদান দিয়েছেন, তাদের অভিনন্দন জানাই এবং তাদের পরবর্তী জীবনে এই যে কোর্স থেকে যারা শিক্ষা দিয়েছেন, যে ট্রেনিং নিয়েছেন, একটিভ টিচিং এ এবং একটিভ লার্নিং এ, তারা কার্যকরভাবে প্রয়োগ করবেন এবং এই ফাউন্ডেশন আরো বড় কর্মসূচী নিতে পারবে, যে, যার লক্ষণ আমরা দেখতে পারছি। সেই তাদেরকে অভিনন্দন জানিয়ে, আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে, আমি আমার বক্তব্যটি এখানেই শেষ করছি।

শ্রুতি লিখন

মোঃ শামিম মণ্ডল, সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, গ্রিন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ